

কুরআন অধ্যয়ন প্রতিযোগিতা ২০২৩

প্রস্তুতি সহায়ক তাফসীর নোট পর্বঃ ১০

সূরা বালাদ

সূরা আল-বালাদ কুরআনের ৯০ তম সূরা; এর আয়াত সংখ্যা ২০ এবং রুকু সংখ্যা ১। সূরা আল-বালাদ মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। বালাদ শব্দের অর্থ নগরী, শহর, দেশ।

নামকরণ :

প্রথম আয়াতে আল বালাদ শব্দটি থেকে সূরার নামকরণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময় কাল :

এই সূরার বিষয়বস্তু ও বর্ণনাভঙ্গী মক্কা মু'আযযমার প্রথম যুগের সূরাগুলোর মতোই। তবে এর মধ্যে একটি ইংগিত পাওয়া যায়, যা থেকে জানা যায়, এই সূরাটি ঠিক এমন এক সময় নাযিল হয়েছিল যখন মক্কায় কাফেররা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধিতায় উঠে পড়ে লেগেছিল এবং তাঁর ওপর সব রকমের জুলুম নিপীড়ন চালানো নিজেদের জন্য বৈধ করে নিয়েছিল।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য :

একটি অনেক বড় বিষয়বস্তুকে এই সূরায় মাত্র কয়েকটি ছোট ছোট বাক্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। একটি পূর্ণ জীবন দর্শন; যা বর্ণনার জন্য একটি বিরাট গ্রন্থের কলেবরও যথেষ্ট বিবেচিত হতো না তাকে এই ছোট সূরাটিতে মাত্র কয়েকটি ছোট ছোট বাক্যে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী পদ্ধতিতে প্রকাশ করা হয়েছে। এটি কুরআনের অলৌকিক বর্ণনা ও প্রকাশ পদ্ধতির পূর্ণতার প্রমাণ। এর বিষয়বস্তু হচ্ছে, দুনিয়ায় মানুষের এবং মানুষের জন্য দুনিয়ার সঠিক অবস্থান, মর্যাদা ও ভূমিকা বুঝিয়ে দেয়া। মানুষকে একথা জানিয়ে দেয়া যে আল্লাহ মানুষের জন্য সৌভাগ্যের ও দুর্ভাগ্যের উভয় পথই খুলে রেখেছেন, সেগুলো দেখার ও সেগুলোর ওপর দিয়ে চলার যাবতীয় উপকরণও তাদেরকে সরবরাহ করেছেন। এবং মানুষ সৌভাগ্যের পথে চলে শুভ পরিণতি লাভ করবে অথবা দুর্ভাগ্যের পথে চলে অশুভ পরিণতির মুখোমুখি হবে, এটি তার নিজের প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমের ওপর নির্ভর করে।

প্রথমে মক্কা শহরকে, এর মধ্যে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যেসব বিপদের সম্মুখীন হতে হয় সেগুলোকে এবং সমগ্র মানব জাতির অবস্থাকে এই সত্যটির সপক্ষে এই মর্মে সাক্ষী হিসেবে পেশ করা হয়েছে যে, এই দুনিয়াটা মানুষের জন্য কোন আরাম আয়েশের জায়গা নয়। এখানে ভোগ বিলাসে মত্ত হয়ে আনন্দ উল্লাস করার জন্য তাকে পয়দা করা হয়নি। বরং এখানে কষ্টের মধ্যে তার জন্ম হয়েছে। এই বিষয়বস্তুটিকে সূরা আন নাজমের (وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى) (মানুষ যতটুকু প্রচেষ্টা চালাবে ততটুকুর ফলেরই সে অধিকারী হবে।) আয়াতটির সাথে মিলিয়ে দেখলে একথা একেবারে সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, দুনিয়ার এই কর্মচাঞ্চল্যে মানুষের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে তার কর্মতৎপরতা, প্রচেষ্টা, পরিশ্রম ও কষ্টসহিষ্ণুতার ওপর।

এরপর মানুষই যে এখানে সবকিছু এবং তার ওপর এমন কোন উচ্চতর ক্ষমতা নেই যে তার কাজের তত্ত্বাবধান করবে এবং তার কাজের যথাযথ হিসেব নেবে, তার এই ভুল ধারণা দূর করে দেয়া হয়েছে।

তারপর মানুষের বহুতর জাহেলী নৈতিক চিন্তাধারার মধ্য থেকে একটি দৃষ্টান্ত স্বরূপ গ্রহণ করে দুনিয়ায় সে অহংকার ও শ্রেষ্ঠত্বের যেসব ভুল মানদণ্ডের প্রচলন করে রেখেছে তা তুলে ধরা হয়েছে। যে ব্যক্তি নিজের বড়াই করার জন্য বিপুল পরিমাণ ধন - সম্পদ ব্যয় করে সে নিজেও নিজের এই বিপুল ব্যয় বহরের জন্য গর্ব করে এবং লোকেরা তাকে বাহবা দেয়। অথচ যে সর্বশক্তিমান সত্তা তার কাজের তত্ত্বাবধান করছেন তিনি দেখতে চান, সে এই ধন সম্পদ কিভাবে উপার্জন করেছে এবং কিভাবে, কি উদ্দেশ্যে এবং কোন মনোভাব সহকারে এসব ব্যয় করেছে।

এরপর মহান আল্লাহ বলছেন, আমি মানুষকে জ্ঞানের বিভিন্ন উপকরণ এবং চিন্তা ও উপলব্ধির যোগ্যতা দিয়ে তার সামনে ভালো ও মন্দ দু'টো পথই উন্মুক্ত করে দিয়েছি। একটি পথ মানুষকে নৈতিক অধিপাতে নিয়ে যায়। এ পথে চলার জন্য কোন কষ্ট স্বীকার করতে হয় না। বরং তার প্রবৃত্তি সাধ মিটিয়ে দুনিয়ার সম্পদ উপভোগ করতে থাকে। দ্বিতীয় পথটি মানুষকে নৈতিক উন্নতির দিকে নিয়ে যায়। এটি একটি দুর্গম গিরিপথের মতো। এ পথে চলতে গেলে মানুষকে নিজের প্রবৃত্তি ওপর জোর খাটাতে হয়। কিন্তু নিজের দুর্বলতার কারণে মানুষ এই গিরিপথে ওঠার পরিবর্তে গভীর খাদের মধ্যে গড়িয়ে পড়াই বেশী পছন্দ করে।

তারপর যে গিরিপথ অতিক্রম করে মানুষ ওপরের দিকে যেতে পারে সেটি কি তা আল্লাহ বলেছেন। তা হচ্ছে: গর্ব ও অহংকার মূলক এবং লোক দেখানো ও প্রদর্শনী মূলক ব্যয়ের পথ পরিত্যাগ করে নিজের ধন - সম্পদ এতিম ও মিসকিনদের সাহায্যার্থে ব্যয় করতে হবে। আল্লাহর প্রতি ও তাঁর দীনের প্রতি ঈমান আনতে হবে আর ঈমানদারদের দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে এমন একটি সমাজ গঠনে অংশ গ্রহণ করতে হবে, যা ধৈর্য সহকারে সত্যপ্রীতির দাবী পূরণ এবং আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি করুণা প্রদর্শন করবে। এই পথে যারা চলে তারা পরিণামে আল্লাহর রহমতের অধিকারী হয়। বিপরীত পক্ষে অন্যপথ অবলম্বনকারীরা জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে। সেখান থেকে তাদের বের হবার সমস্ত পথই থাকবে বন্ধ।

আগের সূরা ও পরের সূরার সাথে সম্পর্ক

আগের ৮৯ তম সূরা আল ফাজর এর শেষে প্রশান্ত আত্মাকে আল্লাহর দিকে সন্তুষ্ট চিত্তে অন্য বান্দাদের সাথে সামিল হওয়ার কথা বলা হয়েছে। (আয়াত ২৭-২৯) এই ৯০ তম সূরা (আল বালাদ) য় শুরুতেই (আয়াত ১) মক্কার কথা বলা হয়েছে যে জায়গাটি দুনিয়ার সবচাইতে প্রশান্ত। এখানে হজ্জের সময় তো অবশ্যই, অন্য সময়েও মানুষ সন্তুষ্ট চিত্তে অন্য বান্দাদের সাথে সামিল হয় 'লাব্বাইক' বলে।

সূরা ফাজর এর আয়াত ১৭ তে এতীমদের উপযুক্ত সম্মান না দেয়া মানুষদের কথা বর্ণিত হয়েছে, অপরদিকে সূরা আল বালাদের আয়াত ১৫ তে এতীমদের সম্মান দিয়ে সাহায্যকারী মানুষদের কথা বর্ণিত হয়েছে।

এই (৯০ তম) সূরা আল বালাদ এর ১০ নম্বর আয়াতে দুটি সুস্পষ্ট ভিন্ন পথের কথা উল্লেখ রয়েছে। এবং ১৮ ও ১৯ নম্বর আয়াতে ই ২ পথের পথিকদের ২ টি (ডান ও বাম) পন্থী হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ঐ সূরার ৮ ও ৯ নম্বর আয়াতে সবারই চোখ, জিহবা ও ঠোট থাকার পরও কেন ভিন্ন ২ পথে তারা যায় তার বিবরণ ও ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে পরের ৯১ তম সূরা আশ শামছ তে। মূলত নাফসের ২ টি ভিন্ন প্রবণতার কারনেই মানুষের পথ চলা ভিন্ন হয় যা সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে সূরা আশ শামছ এর আয়াত ৮ এ।

১. আমি শপথ করছি এ নগরের

বাক্যের শুরুতে 'না' বোধক নয়। বরং 'অতিরিক্ত' হিসাবে আনা হয়েছে তযীহ ও তাকীদের জন্য এবং প্রতিপক্ষের ভ্রান্ত ধারণা খণ্ডন করার জন্যে এই 'না' শব্দটি শপথ বাক্যের শুরুতে ব্যবহৃত হয়। উদ্দেশ্য এই যে, এটা কেবল আপনার ধারণা নয়; বরং আমি শপথ সহকারে যা বলছি, তাই বাস্তব সত্য। শপথের সাথে 'না' - এর ব্যবহার আরবী বাকরীতিতে খুবই প্রসিদ্ধ। সূরা কিয়ামাহেও এর ব্যবহার রয়েছে।

البلد বা নগরী বলে এখানে মক্কা নগরীকে বোঝানো হয়েছে। সূরা আত-ত্বীনেও এমনভাবে মক্কা নগরীর শপথ করা হয়েছে এবং তদসঙ্গে أمين বিশেষণও উল্লেখ করা হয়েছে।

মক্কাবাসীরা নিজেরাই তাদের নগরের পটভূমি জানতো। তারা জানতো, কিভাবে পানি ও বৃষ্ণলতাহীন একটি ধূসব উপত্যকায় নির্জন পাহাড়ের মাঝখানে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম নিজের এক স্ত্রী দুধের বাচ্চাকে এখানে এনে নিঃসংগভাবে ছেড়ে গিয়েছিলেন। কিভাবে এখানে একটি ঘর তৈরি করে হজ্জের ঘোষণা শুনিয়ে দিয়েছিলেন। অথচ বহু দূর - দূরান্তে এই ঘোষণা শোনারও কেউ ছিল না। তারপর কিভাবে একদিন এই নগরটি সমগ্র আরবের কেন্দ্রে পরিণত হলো এবং এমন একটি 'হারম' - সম্মানিত স্থানে হিসেবে গণ্য হলো, যা শত শত বছর পর্যন্ত আরবের সরজমিনে, যেখানে আইন শৃংখলার কোন অস্তিত্বই ছিল না সেখানে এই নগরটি ছাড়া আর কোথাও শান্তি ও নিরাপত্তার কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যেতো না।

মক্কা ছিল পবিত্র ও নিরাপদ নগরী। কিন্তু ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার পর সেই সময়ে অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে, নবী মুহাম্মাদ (স) এর জন্য সেখানে কোন নিরাপত্তা ছিলো না। তাকে কষ্ট ও যন্ত্রনা দেয়া এমনকি তাকে হত্যা করার উপায় উদ্ভাবন করা ও তাতে চেষ্টা করা পর্যন্ত হালাল করে নেয়া হয়েছিল।

২. আর আপনি এ নগরের অধিবাসী

حِلٌّ শব্দের দুটি অর্থ হতে পারে (এক) এটা حلول থেকে উদ্ভূত। অর্থ কোন কিছুতে অবস্থান নেয়া, থাকা ও অবতরণ করা। সে হিসেবে আয়াতের মর্মার্থ এই যে, মক্কা নগরী নিজেও সম্মানিত ও পবিত্র, বিশেষত আপনিও এ নগরীতে বসবাস করেন। বসবাসকারীর শ্রেষ্ঠত্বের দরুনও বাসস্থানের শ্রেষ্ঠত্ব বেড়ে যায়। কাজেই আপনার বসবাসের কারণে এ নগরীর মাহাত্ম্য ও সম্মান দ্বিগুণ হয়ে গেছে। [ফাতহুল কাদীর] (দুই) এটা حل থেকে উদ্ভূত। অর্থ হালাল হওয়া। এদিক দিয়ে এক অর্থ এই যে, আপনাকে মক্কার কাফেররা হালাল মনে করে রেখেছে এবং আপনাকে হত্যা করার ফিকিরে রয়েছে; অথচ তারা নিজেরাও মক্কা নগরীতে কোন শিকারকেই হালাল মনে করে না।

এমতাবস্থায় তাদের যুলুম ও অবাধ্যতা কতটুকু যে, তারা আল্লাহর রাসূলের হত্যাকে হালাল মনে করে নিয়েছে। অপর অর্থ এই যে, আপনার জন্যে মক্কার হারামে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হালাল করে দেওয়া হবে। [ইবন কাসীর] বস্তুত মক্কা বিজয়ের সময় একদিনের জন্যেই তাই করা হয়েছিল। আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু

আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন মাথায় শিরজ্ঞাণ পরিধান করে মক্কায় প্রবেশ করলেন, তারপর যখন তিনি তা খুললেন, এক লোক এসে তাকে বলল যে, ইবনে খাতল কা'বার পর্দা ধরে আছে। তিনি বললেন, 'তাকে হত্যা করা। [বুখারী: ১৮৪৬, মুসলিম: ৪৫০] কারণ, পূর্ব থেকেই তার মৃত্যুদণ্ডের ঘোষণা রাসূল দিয়েছিলেন।

وَالِدٍ وَمَا وَلَدَ

৩. শপথ জন্মদাতার ও যা সে জন্ম দিয়েছে।

যেহেতু বাপ ও তার ঔরসে জন্ম গ্রহণকারী সন্তানদের ব্যাপারে ব্যপক অর্থবোধক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে এবং সামনের দিকে মানুষের কথা বলা হয়েছে, তাই বাপ মানে আদম আলাইহিস সালামই হতে পারেন। আর তার ঔরসে জন্ম গ্রহণকারী সন্তান বলতে দুনিয়ায় বর্তমানে যত মানুষ পাওয়া যায়, যত মানুষ অতীতে পাওয়া গেছে এবং ভবিষ্যতেও পাওয়া যাবে সবাইকে বুঝানো হয়েছে। এভাবে এতে আদম ও দুনিয়ার আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সব বনী-আদমের শপথ করা হয়েছে। অথবা وَالِدٌ বলে প্রত্যেক জন্মদানকারী পিতা আর وَلَدٌ বলে প্রত্যেক সন্তানকে বুঝানো হয়েছে।

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ

৪. নিঃসন্দেহে আমরা মানুষকে সৃষ্টি করেছি কষ্ট-ক্লেশের মধ্যে।

এটি পূর্বোক্ত আয়াতসমূহের জওয়াব। আল্লাহ তাঁর যেকোন সৃষ্টির শপথ করে থাকেন। আর এর দ্বারা উক্ত সৃষ্টির মর্যাদা বৃদ্ধি উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। সূরার শুরুতে মক্কা নগরী, অতঃপর আদম ও বনু আদম বা পিতা ও সন্তানদের শপথ করে, অতঃপর ۞ ও ۞ সহ মোট তিনটি তাকীদ সহযোগে আল্লাহ বলছেন যে, আমরা অবশ্যই মানুষকে ক্লেশনির্ভর প্রাণীরূপে সৃষ্টি করেছি।

کَبَدٍ অর্থ مشقة 'কষ্ট ও ক্লেশ'। মানুষ তার মায়ের গর্ভ থেকেই নানাবিধ কষ্ট ও রোগ-পীড়ার সম্মুখীন হয়। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত নানারূপ বিপদাপদ ও কায়-ক্লেশের মধ্য দিয়ে তাকে জীবন অতিবাহিত করতে হয়। যদিও দৈহিক কষ্ট-দুঃখ অন্য প্রাণীর জীবনেও হয়ে থাকে। তথাপি মানুষের বিষয়টি নির্দিষ্টভাবে বলার কারণ হ'ল সম্ভবতঃ এই যে, (১) মানুষ হ'ল সবচেয়ে বিস্ময়কর সৃষ্টি। যাকে কথা বলার ও ব্যবস্থাপনার ক্ষমতা দান করা হয়েছে। (২) মানুষ একমাত্র প্রাণী যাকে জ্ঞান সম্পদ দান করা হয়েছে। সেকারণ তাকে তার প্রতিটি কথা ও কাজের জন্য জবাবদিহি করতে হয়। (৩) মানুষের উপলব্ধি ও চেতনাবোধ অন্য সকল প্রাণীর চাইতে বেশী। তাছাড়া যার জ্ঞান ও বিবেকশক্তি যত প্রখর তার চেতনা ও দূরদৃষ্টি তত প্রখর। ফলে পরিশ্রমের কষ্ট চেতনাভেদে কম-বেশী হয়ে থাকে। (৪) মানুষকে তার সারা জীবনের কর্মের হিসাব ক্রিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকটে দিতে হয়। যা অন্য প্রাণীকে দিতে হয় না। (৫) মানুষের জন্য তার পার্থিব জীবনটা হ'ল পরীক্ষাগার। প্রতি পদে পদে তাকে পরীক্ষা দিয়ে

চলতে হয়। তাই মানুষের স্বাভাবিক ও শ্রেষ্ঠত্বকে এবং তার দায়িত্ববোধকে স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যই এখানে মানুষকে মূল আলোচ্য বিষয় হিসাবে পেশ করা হয়েছে।

أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَفْقَدَ عَلَيْهِ أَحَدٌ

৫. সে কি মনে করে যে, কখনো তার উপর কেউ ক্ষমতাবান হবে না?

শক্তিগর্বে স্ফীত অহংকারী মানুষকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ ধমকের সুরে কথাগুলি বলেছেন। যেমন বিগত যুগে ‘আদ জাতি বলেছিল ‘কে আছে আমাদের চাইতে অধিক শক্তিশালী’? (হা-মীম সাজদাহ ৪১/১৫)। অর্থাৎ সে কি ভেবেছে তাকে দমন করার কেউ নেই? অথবা সে কি ভেবেছে ক্রিয়ামত হবে না এবং তার অত্যাচারের বদলা নেওয়া হবে না?

অথচ আখেরাত আসার আগে এই দুনিয়াতেই সে প্রতি মুহূর্তে দেখছে, তার তাকদীরের ওপর অন্য একজনের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। তাঁর সিদ্ধান্তের সামনে তার নিজের সমস্ত জারিজুরি, কলা - কৌশল পুরোপুরি ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। ভূমিকম্পের একটি ধাক্কা, ঘূর্ণিঝড়ের একটি আগাত এবং নদী ও সাগরের একটি জলোচ্ছ্বাস তাকে একথা বলে দোবার জন্য যথেষ্ট যে, আল্লাহর শক্তির তুলনায় সে কতটুকু ক্ষমতা রাখে। একটি আকস্মিক দুর্ঘটনা একজন সুস্থ সবল সক্ষম মানুষকে পংগু করে দিয়ে যায়। ভাগ্যের একটি পরিবর্তন একটি প্রবল পরাক্রান্ত বিপুল ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী ব্যক্তিকে আকাশ থেকে পাতালে নিক্ষেপ করে। উন্নতির উচ্চতম শিখরে অবস্থানকারী জাতিদের ভাগ্য যখন পরিবর্তিত হয়ে তখন এই দুনিয়ায় যেখানে তাদের চোখে চোখ মেলাবার হিম্মত করোর ছিল না সেখানে তারা লাঞ্চিত ও পদদলিত হয়। এহেন মানুষের মাথায় কেমন করে একথা স্থান পেলো যে, তার ওপর কারোর জোর খাটবে না ?

يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَا لَا بِنَاءَ

৬. সে বলে, আমি প্রচুর অর্থ নিঃশেষ করেছি।

বলা হয়েছে সে বলে “আমি প্রচুর ধন-সম্পদ উড়িয়ে দিয়েছি”। এই শব্দগুলোই প্রকাশ করে, বজ্র তার ধন-সম্পদের প্রাচুর্যে কী পরিমাণ গর্বিত। যে বিপুল পরিমাণ ধন সে খরচ করেছে নিজের সামগ্রিক সম্পদের তুলনায় তার কাছে তার পরিমাণ এত সামান্য ছিল যে, তা উড়িয়ে বা ফুকিয়ে দেবার কোন পরোয়াই সে করেনি। আর এই সম্পদ সে কোন কাজে উড়িয়েছে? কোন প্রকৃত নেকীর কাজে নয়, যেমন সামনের আয়াতগুলো থেকে প্রকাশিত হচ্ছে। বরং এই সম্পদ সে উড়িয়েছে নিজের ধনাঢ্যতার প্রদর্শনী এবং নিজের অহংকার ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করার জন্য।

أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ

৭. সে কি মনে করে যে, তাকে কেউ দেখেনি?

অর্থাৎ ধনশালী অহংকারী ব্যক্তিটি কত সম্পদ ব্যয় করেছে এবং কি উদ্দেশ্যে ব্যয় করেছে, সে কি ভেবেছে যে কেউ তা দেখেনি? অবশ্যই তা আল্লাহ দেখেছেন। তিনি তার ভিতর-বাহির সব খবর জানেন এবং সবকিছুর হিসাব তিনি নেবেন। তিনি বলেন, ‘আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহর জন্য। তোমাদের মনের মধ্যে যা আছে, তা তোমরা প্রকাশ করো বা গোপন করো, তার হিসাব তোমাদের কাছ থেকে আল্লাহ নিবেন।

অতঃপর তিনি যাকে ইচ্ছা মাপ করবেন ও যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিবেন। আল্লাহ সকল বিষয়ে ক্ষমতাশালী’ (বাক্বারাহ ২/২৮৪)।

ধন-সম্পদের মূল মালিক আল্লাহ। বান্দাকে তিনি দেন, তাকে পরীক্ষা করার জন্য। অতএব মালিকের নির্দেশমত আয়-ব্যয় না করলে সে খেয়ানতকারী হিসাবে উখিত হবে এবং যথাযথ শাস্তি ভোগ করবে।

أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ

৮. আমরা কি তার জন্য সৃষ্টি করিনি দু'চোখ?

وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ

৯. আর জিহ্বা ও দুই ঠোঁট?

আল্লাহ এখানে মানুষকে দেওয়া তিনটি অত্যন্ত মূল্যবান নে‘মতের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, যা টাকা-পয়সা ও ধন-সম্পদের চাইতে বহু বহু গুণ মূল্যবান। আর তা হ’ল মানুষের ‘দু’টি চোখ’, যা দিয়ে সে দেখে ও সৌন্দর্য উপভোগ করে। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে আল্লাহর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সৃষ্টিসমূহ সে পর্যবেক্ষণ করে। দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে লক্ষ-কোটি মাইল দূরে লুক্কায়িত নক্ষত্ররাজি অবলোকন করে। সাগরগর্ভে লুক্কায়িত মণি-মুক্তা উত্তোলন করে। এভাবে সে তার দু’চোখের মাধ্যমে আকাশ ও পৃথিবীর অসংখ্য সৃষ্টিরাজি স্বচক্ষে দেখে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর অস্তিত্ব ও তাঁর সৃষ্টিকৌশল সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান লাভ করে ও সেখান থেকে কল্যাণ আহরণ করে।

‘জিহবার’ সাহায্যে সে কথা বলে, খাদ্যের স্বাদ আনন্দন করে এবং দুই মাড়ির দাঁতের মাঝে খাদ্য ঠেলে দেয়। যাতে তা ভালোভাবে চিবিয়ে হضم করা সহজ হয়। সর্বক্ষণ সরস জিহবার সাহায্যে মানুষ তার মনের কথা স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করতে পারে। এছাড়া জিহবার লালার তার খাদ্য হضمে সাহায্য করে এবং চর্মের উপরের ক্ষত ও বিষ নাশ করে।

‘দু’টি ঠোঁট’ মানুষের মুখগহবরের দু’টি কপাট হিসাবে ব্যবহৃত হয়। যা তার পর্দা করে ও চেহারার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। যা মুখের ভিতরে খাদ্যের সঞ্চালন করে এবং শব্দ ও বর্ণের যথাযথ উচ্চারণে সাহায্য করে। যদি ঠোঁট বা জিহবা ক্ষণিকের জন্য অসাড়া হয়ে যায়, তাহ’লে সে বুঝতে পারে এ দু’টির মূল্য কত বেশী!

উক্ত নে‘মতগুলি দেওয়ার উদ্দেশ্য এটা পরীক্ষা করা যে, বান্দা এগুলিকে কল্যাণের পথে ব্যয় করে, না অকল্যাণের পথে ব্যয় করে। সে এগুলিকে আল্লাহর পথে পরিচালিত করে, না শয়তানের পথে পরিচালিত করে। এজন্যেই বলা হয়, একটা মানুষ পূর্ণ মুমিন হয় তখনই, যখন তার হাত-পা, চোখ-কান ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পূর্ণভাবে মুসলমান হয়। অর্থাৎ ইসলামী শরী‘আতের অনুসারী হয়। ইঞ্জিন ভাল থাকলেও পার্টস খারাব হ’লে যেমন ইঞ্জিন চলে না, অনুরূপভাবে ঈমান যত ময়বুত হৌক, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যদি শয়তানের তাবেদার হয়, তাহ’লে হৃদয়ের ঐ ঈমানের জ্যোতিটুকুও এক সময় নিভে যাবে। অতএব চোখ কান ইত্যাদিকে কঠোরভাবে হেফাযত করতে হবে, যেন ঐ দু’টি খোলা জানালা দিয়ে কোন নাপাক চিন্তা ভিতরে প্রবেশ না করে এবং তা হৃদয়কে কলুষিত না করে। আল্লাহ বলেন, ‘যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই, তার পিছে পড়ো না। নিশ্চয় কান, চোখ ও অন্তঃকরণ এদের প্রত্যেকটিই জিজ্ঞাসিত হবে’ (বনু ইসরাঈল ১৭/৩৬)।

১০. আর আমরা তাকে দেখিয়েছি দুটি পথ।

ভাল ও মন্দ দুটি পথের দিশাই আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাকে দিয়েছেন। শুধুমাত্র বুদ্ধি ও চিন্তার শক্তি দান করে তাকে নিজের পথ নিজে খুঁজে নেবার জন্য ছেড়ে দেননি। বরং তাকে পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। তার সামনে ভালো ও মন্দ এবং নেকী ও গোনাহের দু'টি পথ সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন। ভালোভাবে চিন্তা-ভাবনা করে তার মধ্য থেকে নিজ দায়িত্বে যে পথটি ইচ্ছা সে গ্রহণ করতে পারে। পবিত্র কুরআনের অন্যত্রও এই একই কথা বলা হয়েছে, সেখানে এসেছে, “আমি মানুষকে একটি মিশ্রিত বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছি, যাতে তার পরীক্ষা নেয়া যায় এবং এ উদ্দেশ্যে আমি তাকে শ্রবণ শক্তি ও দৃষ্টিশক্তির অধিকারী করেছি। আমি তাকে পথ দেখিয়ে দিয়েছি, চাইলে সে শোকরকারী হতে পারে বা কুফরকারী।” [সূরা আল-ইনসান: ২-৩]

نَجْدَيْنِ শব্দটি نَجْدٌ এর দ্বিবচন। এর শাব্দিক অর্থ উর্ধ্বগামী পথ। এখানে প্রকাশ্য পথ বোঝানো হয়েছে। এপথ দুটির একটি হচ্ছে সৌভাগ্য ও সাফল্যের পথ এবং অপরটি হচ্ছে অনিষ্ট ও ধ্বংসের পথ। এ পথ দুটির একটি গেছে ওপরের দিকে। কিন্তু সেখানে যেতে হলে খুব কষ্ট ও পরিশ্রম করতে হয়। সে পথটি বড়ই দুর্গম। সে পথে যেতে হলে মানুষকে নিজের প্রবৃত্তি ও তার আকাংখা এবং শয়তানের প্ররোচনার সাথে লড়াই করে এগিয়ে যেতে হয়। আর দ্বিতীয় পথটি বড়ই সহজ। এটি খাদের মধ্যে নেমে গেছে। এই পথ দিয়ে নীচের দিকে নেমে যাবার জন্য কোন পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় না। বরং এ জন্য শুধুমাত্র নিজের প্রবৃত্তির বহাধনটা একটু আলগা করে দেয়াই যথেষ্ট। তারপর মানুষ আপনা আপনি গড়িয়ে যেতে থাকে। এখন এই যে ব্যক্তিকে আমি দু'টি পথই দেখিয়ে দিয়েছিলাম। সে ঐ দু'টি পথের মধ্য থেকে নীচের দিকে নেমে যাবার পথটি গ্রহণ করে নিয়েছে এবং ওপরের দিকে যে পথটি গিয়েছে সেটি পরিত্যাগ করেছে।

১১. কিন্তু সে দুর্গম গিরিপথ অতিক্রম করার সহস করেনি।

عَقَبَةٌ বলা হয় পাহাড়ের মাঝে মাঝে রাস্তা বা গিরিপথকে। সাধারণতঃ এ পথ বড় দুস্তর, দুরতিক্রম্য ও সংকটময় হয়। অর্থাৎ এখানে বলা হচ্ছে, দু'টি পথ আমি তাকে দেখিয়েছি। একটি গেছে ওপরের দিকে। কিন্তু সেখানে যেতে হলে খুব কষ্ট ও পরিশ্রম করতে হয়। সে পথটি বড়ই দুর্গম। সে পথে যেতে হলে মানুষকে নিজের প্রবৃত্তি ও তার আকাংকা এবং শয়তানের প্ররোচনার সাথে লড়াই করে এগিয়ে যেতে হয়। আর দ্বিতীয় পথটি বড়ই সহজ। এটি খাদের মধ্যে নেমে গেছে। এই পথ দিয়ে নেমে যাবার জন্য কোন পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় না। বরং এ জন্য শুধুমাত্র নিজের প্রবৃত্তির বাঁধনাটা একটু আলগা করে দেয়াই যথেষ্ট। তারপর মানুষ আপনা আপনি গড়িয়ে যেতে থাকে। এখন এই যে ব্যক্তিকে আমি দু'টি পথই দেখিয়ে দিয়েছিলাম সে ঐ দু'টি পথের মধ্য থেকে নীচের দিকে নেমে যাবার পথটি গ্রহণ করে নিয়েছে এবং ওপরের দিকে যে পথটি গিয়েছে সেটি পরিত্যাগ করেছে।

وَمَا أَذْرَاكَ مَا الْعُقْبَةُ

১২. আর কিসে আপনাকে জানাবে— দুর্গম গিরিপথটি কি ?

‘কোন বস্তু তোমাকে জানাবে?’। এর মাধ্যমে দ্বীনী আমলের উচ্চ মর্যাদা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। الْعُقْبَةُ অর্থ ‘গিরিসংকটে প্রবেশ করাটা কী?’ প্রশ্নের আকারে বলার উদ্দেশ্য হ’ল আল্লাহর নিকট সৎকর্মের উচ্চ মর্যাদার বিষয়টি শ্রোতার হৃদয়ে প্রোথিত করে দেওয়া। ‘যখন কোন বিষয়ে আল্লাহ বলেন, وَأَذْرَا তখন তিনি সে বিষয়টি জানিয়ে দেন। আর যখন বলেন, وَمَا أَذْرَا তখন সে বিষয়টি জানিয়ে দেন না’। যেমন এখানে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সূরা ‘আবাসা ৩ আয়াতে জানিয়ে দেননি।

অতঃপর উদাহরণ স্বরূপ এখানে পরপর তিনটি ঘাঁটি তথা নেক আমলের কথা বলা হয়েছে, যা আল্লাহর নিকট খুবই মর্যাদাপূর্ণ। যেমন-

فَأَنْزِلْ رَقَبَةً

১৩. এটা হচ্ছেঃ দাসমুক্তি

‘দাসমুক্তি’ দু’ধরনের হ’তে পারে। এক- ক্রীতদাসমুক্তি। দুই- কয়েদীমুক্তি। যেমন আল্লাহ সৎকর্মশীলদের গুণাবলী বর্ণনা করে বলেন, ‘তারা আল্লাহর মহব্বতে অভাবগ্রস্ত, ইয়াতীম ও কয়েদীদের আহাৰ্য প্রদান করে’ (দাহর ৭৬/৮)।

আলোচ্য আয়াতে উদাহরণ স্বরূপ প্রথম ঘাঁটির কথা বলা হয়েছে। আর তা হ’ল ‘দাসমুক্তি’। জাহেলী আরবে দাস-দাসী ক্রয়-বিক্রয় হ’ত। এতে তাদের স্বাধীন সত্তা বিলীন হয়ে যেত। সারা জীবন তাদের ও তাদের সন্তানাদিকে দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ থাকতে হ’ত। এই অবস্থা তৎকালীন বিশ্বে প্রায় সর্বত্র চালু ছিল। ইসলাম এটাকে সেযুগে মানবতার বিরুদ্ধে এক নম্বরের অপরাধ বলে চিহ্নিত করেছে এবং এটিকে সমাজ থেকে উৎখাতের চেষ্টা করেছে। যুগ যুগ ধরে প্রচলিত এই নিবর্তনমূলক সমাজ ব্যবস্থাকে এক হুকুমে উঠিয়ে দেওয়া সম্ভব ছিল না। তাই ইসলাম একে সুকৌশলে উঠিয়ে দেবার চেষ্টা করেছে এবং দাস-দাসী মুক্ত করাকে সর্বাধিক পুণ্যের কাজ হিসাবে ঘোষণা করেছে। ফলে ইসলাম কবুলকারীদের পরিবারসমূহ যেমন দাস-দাসী থেকে মুক্ত হয়ে যায়, তেমনি হযরত আবুবকর, হযরত ওহমান প্রমুখ সচ্ছল ছাহাবায়ে কেরাম কাফেরদের ঘরে নির্যাতিত বহু দাস-দাসীকে অর্থের বিনিময়ে খরিদ করে নিঃস্বার্থভাবে স্রেফ আল্লাহর ওয়াস্তে মুক্ত করে দেন। এটি যেহেতু অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও আয়াসসাধ্য নেক আমল, তাই এটাকেই পাহাড়ের প্রথম উঁচু ঘাঁটি হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে, যার সোপান বেয়ে মুমিন নর-নারী জান্নাতে প্রবেশ করবে।

أَوْ إِطْعَمٌ فِي يَوْمٍ مَسْغَبَةٍ

১৪. অথবা দুর্ভিক্ষের দিনে খাদ্যদান

দ্বিতীয় সৎকর্ম হচ্ছে ক্ষুধার্তকে অন্নদান। যে কাউকে অন্নদান করলে তা আরও বিরাট সওয়াবের কাজ হয়ে যায়। তাই বলা হয়েছে, বিশেষভাবে যদি আত্মীয় ইয়াতীমকে অন্নদান করা হয়, তবে তাতে দ্বিগুণ সওয়াব হয়।

(এক) ক্ষুধার্তের ক্ষুধা দূর করার সওয়াব এবং (দুই) আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা ও তার হক আদায় করার সওয়াব। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “কোন মুসলিম ক্ষুধার্তকে অন্তদান ক্ষমাকে অবশ্যম্ভাবী করে”।

يَتِيماً ذَا مَقْرَبَةٍ

১৫. ইয়াতীম আত্মীয়কে

এ ধরনের ইয়াতীমের হক সবচেয়ে বেশী। একদিকে সে ইয়াতীম, দ্বিতীয়ত সে তার নিকটাত্মীয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ‘মিসকীনকে দান করা নিঃসন্দেহে একটি দান। কিন্তু আত্মীয়দের দান করা দুটি। দান ও আত্মীয়তার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা। [মুসনাদে আহমাদ: ৪/২১৪, তিরমিযী: ৬৫৩]

أَوْ مَسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ

১৬. অথবা দারিদ্র-নিষ্পেষিত নিঃস্বকে,

ماটি-মাখা বা ধূলায় লুপ্তিত। অর্থাৎ, যে দারিদ্রের কারণে মাটি বা ধূলার উপর পড়ে থাকে। তার নিজ ঘর-বাড়ি বলেও কিছু থাকে না। মোট কথা হল যে, কোন ক্রীতদাস স্বাধীন করা, কোন ক্ষুধার্ত আত্মীয় অনাথ কিংবা মিসকীনকে খাবার দান করা গরিপথে চলার মত কঠিন কাজ। যার দ্বারা মানুষ জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে জান্নাত লাভ করতে পারে। অনাথের তত্ত্বাবধান করা এমনিতেই বিরাট পুণ্যের কাজ। কিন্তু যদি সে আত্মীয় হয়, তাহলে তার তত্ত্বাবধান করায় আছে দ্বিগুণ সওয়াব; এক সদকা করার সওয়াব এবং দুই আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখার ও তার হক আদায় করার সওয়াব। অনুরূপ ক্রীতদাস স্বাধীন করারও বড় ফযীলত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ

১৭. ‘অতঃপর তাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং পরস্পরকে ছবরের উপদেশ দেয় ও পরস্পরের প্রতি দয়ার উপদেশ দেয়’।

অর্থাৎ ওপরে উল্লেখিত গুণাবলী অর্জনের সাথে সাথে তার জন্য মু‘মিন হওয়াও জরুরী। কারণ ঈমান ছাড়া কোন কাজ সৎকাজ হিসেবে চিহ্নিত হতে এবং আল্লাহর কাছে ও গৃহীত হতে পারে না। কুরআন মজীদে বিভিন্ন স্থানে এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে ঈমান সহকারে যে সৎকাজ করা হয় একমাত্র সেটিই নেকী ও মুক্তির উপায় হিসেবে গৃহীত হয়। যেমন সূরা নিসায় বলা হয়েছে : “ পুরুষ বা নারী যে ব্যক্তিই সৎকাজ করে সে যদি মু‘মিন হয়, তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। ” (১২৪ আয়াত) সূরা নাহলে বলা হয়েছে : “ পুরুষ বা নারী যে ব্যক্তিই সৎকাজ করবে সে যদি মু‘মিন হয় তাহলে আমি তাকে পবিত্র জীবন যাপন করাবো এবং এই ধরনের লোকদেরকে তাদের সর্বোত্তম কাজ অনুযায়ী প্রতিদান দেবো। ” (৯৭ আয়াত) সূরা মু‘মিনে বলা হয়েছে : “ পুরুষ বা নারী যেই সৎকাজ করবে সে যদি মু‘মিন হয় তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। সেখানে তাকে দেয়া হবে বেহিসেব রিযিক। ” (৪০ আয়াত) যে কোন ব্যক্তিই কুরআন মজীদ অধ্যয়ন করলে দেখতে

পাবেন এ কিতাবের যেখানেই সংকাজ ও তার উত্তম প্রতিদানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেখানেই অবশ্যই তার সাথে ঈমানের শর্ত লাগানো হয়েছে। ঈমান বিহীন আমল আল্লাহর কাছে কোথাও গ্রহণযোগ্য হয়নি। কোথাও এ ধরনের কাজের বিনিময়ে কোন প্রতিদানের আশ্বাস দেয়া হয়নি। এ প্রসঙ্গে এ বিষয়টিও প্রতিধানযোগ্য যে, আয়াতে একথা বলা হয়নি, " তারপর সে ঈমান এনেছে । " বরং বলা হয়েছে "তারপর সে তাদের মধ্যে সামিল হয়েছে যারা ঈমান এনেছে।"এর অর্থ হয়, নিছক এক ব্যক্তি হিসেবে তার নিজের ঈমান আনাই কেবলমাত্র এখানে উদ্দেশ্য নয় বরং এখানে মূল লক্ষ্য হচ্ছে প্রত্যেক ব্যক্তি ঈমান এনেছে সে দ্বিতীয় ব্যক্তি যে ঈমান এনেছে তার সাথে সামিল হয়ে যাবে। এর ফলে ঈমানদারদের একটি জামায়াত তৈরি হয়ে যাবে। মু'মিনদের একটি সমাজ গড়ে উঠবে। সামগ্রিক ও সমাজবদ্ধভাবে নেকী, সততা ও সংবৃদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে, যেগুলো প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল ঈমানের দাবী ।

وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ঈমানের পরে এখানে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ আমলের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথমটি হ'ল পরস্পরকে ছবর ও ধৈর্যের উপদেশ দেওয়া। ছবর তিন প্রকার। এক- বিপদে ধৈর্য ধারণ করা। ঈমানদার ব্যক্তির উপরে নানাবিধ বিপদ এসে থাকে তাকে ঈমান থেকে ফিরিয়ে নেবার জন্য অথবা তার ঈমানের দৃঢ়তা পরীক্ষা করার জন্য। এমতাবস্থায় ঈমানদার নিজে যেমন ছবর করবে, অন্যকেও তেমনি ছবরের উপদেশ দিবে, যাতে সেও ঈমানের উপরে দৃঢ় থাকতে পারে। দুই- পাপ থেকে নিজেকে বিরত রাখা। পাপের সহজ সুযোগ এসে যাওয়া সত্ত্বেও মুমিনকে তার ঈমান ঐ পাপকর্ম থেকে বিরত রাখে। এটা হ'ল গুরুত্বপূর্ণ ছবর, যার পুরস্কার অনেক বেশী। তিন- আল্লাহর আনুগত্যের উপরে দৃঢ় থাকা। সাময়িকভাবে পাপ থেকে বিরত থাকা এবং আল্লাহর আনুগত্যে ফিরে আসা অনেক সময় সম্ভব হ'লেও স্থায়ীভাবে তার উপরে দৃঢ় থাকা নিঃসন্দেহে কঠিন এবং অবশ্যই তা সর্বোচ্চ ধৈর্য ধারণের অন্তর্ভুক্ত। যার পুরস্কারের কোন শেষ নেই।

আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে থাকেন' (বাক্বারাহ ২/১৫৩)। তিনি বলেন 'ধৈর্যশীলদের বেহিসাব পুরস্কার দান করা হবে' (যুমার ৩৯/১০)। তিনি আরও বলেন 'ছবরের বিনিময়ে তাদেরকে জান্নাতে বিশেষ কক্ষ দান করা হবে এবং তাদেরকে সেখানে মুরাব্বির দায়িত্ব ও সালাম সহকারে অভ্যর্থনা জানানো হবে' (ফুরক্বান ২৫/৭৫)। তিনি বলেন, 'ধৈর্যধারণের পুরস্কার স্বরূপ আল্লাহ তাদেরকে জান্নাত ও রেশমী পোষাক দান করবেন' (দাহর ৭৬/১২)।

وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ সংকর্মটি হ'ল পরস্পরকে দয়া ও অনুগ্রহের উপদেশ দান করা। নিষ্ঠুর এই পৃথিবীতে দয়াগুণের চাইতে বড় গুণ আর নেই। ছবর ও দয়াগুণ মুমিনের সবচেয়ে বড় দু'টি গুণ হিসাবে অত্র আয়াতে উল্লেখ করার মাধ্যমে আল্লাহ অত্র গুণ দু'টির বড়ত্ব ও মর্যাদাকে আরো সমুন্নত করেছেন। 'রহম' বা দয়াগুণ হ'ল আল্লাহর সবচেয়ে বড় গুণ।

مَرْحَمَةٌ এর অর্থ অপরের প্রতি দয়াদ্র হওয়া। অপরের কষ্টকে নিজের কষ্ট মনে করে তাকে কষ্টদান ও যুলুম করা থেকে বিরত হওয়া। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের উম্মতের মধ্যে এই রহম ও করুণাবৃত্তিটির মতো উন্নত নৈতিক বৃত্তিটিকেই সবচেয়ে বেশী প্রসারিত ও বিকশিত করতে চেয়েছেন। হাদীসে এসেছে, "যে মানুষের প্রতি রহমত করে না। আল্লাহ তার প্রতি রহমত করেন না"। [বুখারী: ৭৩৭৬, মুসলিম: ৩১৯, মুসনাদে আহমাদ: ৪/৫৬২] অন্য হাদীসে এসেছে, "যে আমাদের ছোটদের রহমত করে না এবং বড়দের সম্মান পাওয়ার

অধিকারের প্রতি খেয়াল রাখে না সে আমাদের দলভুক্ত নয়”। [আবু দাউদ: ৪৯৪৩, তিরমিযী: ১৯২০] আরও বলা হয়েছে, “যারা রহমতের অধিকারী (দয়া করে) তাদেরকে রহমান রহমত করেন, তোমরা যমীনের অধিবাসীদের প্রতি রহমত কর তবে আসমানের উপর যিনি আছেন (আল্লাহ)। তিনিও তোমাদেরকে রহমত করবেন।” [আবু দাউদ: ৪৯৪১, তিরমিযী: ১৯২৪]

অত্র আয়াতের শুরুতে ثُمَّ (অতঃপর) শব্দ আনার মাধ্যমে পূর্বের তিনটি বস্তুর উপর পরবর্তী বস্তুগুলির উচ্চতর মর্যাদা বুঝানো হয়েছে। যেখানে ঈমান, ছবর ও দয়াশীলতার কথা বর্ণিত হয়েছে। কেননা ঈমান হ’ল সবকিছুর মূল। ছবর হ’ল বীরত্ব ও ন্যায়নিষ্ঠার চূড়ান্ত রূপ। আর দয়াশীলতা হ’ল আল্লাহর বিশেষ গুণ, যা সবকিছুর উপরে। কারু মধ্যে যখন এই গুণগুলি অর্জিত ও বিকশিত হয়, তখন তিনি হন সত্যিকারের মানুষ বা ইনসানে কামেল।

أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ

১৮. ‘এরাই হ’ল ডান সারির মানুষ’।

অর্থাৎ উপরে বর্ণিত গুণাবলীসম্পন্ন মানুষ ক্রিয়ামতের দিন সৌভাগ্যশালীদের জন্য নির্ধারিত ডান সারিতে স্থান পাবে। ক্রিয়ামতের দিন মানুষকে তিন সারিতে ভাগ করা হবে। একটি হবে অগ্রগামী দল, একটি হবে দক্ষিণ সারির দল এবং একটি হবে বাম সারির দল। প্রথম দু’টি দল জান্নাতী হবে এবং বাম সারির লোকেরা জাহান্নামী হবে (ওয়াফি‘আহ ৫৬/৭-১২)। জান্নাতীদের ডান হাতে আমলনামা দেওয়া হবে এবং তাদের সহজ হিসাব নেওয়া হবে (বনু ইস্রাঈল ১৭/৭১; ইনশিক্বাক্ক ৮৪/৭-৮)।

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ

১৯. ‘আর যারা আমাদের আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে, তারা হ’ল বাম সারির লোক’।

হতভাগা অথবা বাম দিকের লোকেরা, যাদের বাম হাতে আমলনামা দেয়া হবে’।
পাপিষ্ঠ কাফের-ফাসেক-মুনাফিকদের ক্রিয়ামতের দিন বাম সারিতে দাঁড় করানো হবে (ওয়াফি‘আহ ৫৬/৯,৪১)। এদের পিঠের পিছন দিয়ে বাম হাতে আমলনামা দেয়া হবে (ইনশিক্বাক্ক ৮৪/১০)। ইবনু আববাস (রাঃ) বলেন, এরাও ডান হাত বাড়িয়ে দেবে। বাম হাত বাড়াতে চাইবে না। ফলে পিছন দিক দিয়ে বাম হাতে আমলনামা দেয়া হবে।

عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤَصَّدَةٌ

২০. ‘তাদের উপরে থাকবে পরিবেষ্টিত অগ্নি’।

مُؤَصَّدَةٌ এর অর্থ হল مُغْلَقَةٌ অর্থাৎ বন্ধ। তার মানে হল, তাদেরকে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করে তার চতুর্দিক বন্ধ করে দেওয়া হবে। যাতে প্রথমতঃ আগুনের সম্পূর্ণ তাপ তাদেরকে পৌঁছে এবং দ্বিতীয়তঃ সেখান হতে পলায়ন করে কোথাও যেতে না পারে।

ফুটনোট

- اللہ বা নগরী বলে এখানে মক্কা নগরীকে বোঝানো হয়েছে। সূরা আত-ত্বীনেও এমনিভাবে মক্কা নগরীর শপথ করা হয়েছে
- আল্লাহ মানুষের জন্য সৌভাগ্যের ও দুর্ভাগ্যের উভয় পথই খুলে রেখেছেন, সেগুলো দেখার ও সেগুলোর ওপর দিয়ে চলার যাবতীয় উপকরণও তাদেরকে সরবরাহ করেছেন। এবং মানুষ সৌভাগ্যের পথে চলে শুভ পরিণতি লাভ করবে অথবা দুর্ভাগ্যের পথে চলে অশুভ পরিণতির মুখোমুখি হবে, এটি তার নিজের প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমের ওপর নির্ভর করে।
- প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমের ফলে মানুষ যখন সফলতার একটা পর্যায়ে পৌঁছে তখন কিছু মানুষ অহংকারী হয়ে ওঠে।
- অহংকারী মানুষ এমন চিন্তাভাবনা করে যে কেউ তার উপর ক্ষমতাবান হতে পারবে না, তাকে পরাজিত করতে পারবে না। মূলত সে ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয় না, তাই ভবিষ্যত সম্পর্কে নিশ্চিত ভাব পোষন করে। অহংকারীরা নিজেদেরকে সর্বময় ক্ষমতাবান মনে করে থাকে।
- ক্ষমতার অহংকারের পাশাপাশি কিছু মানুষ অর্থের দাপট ও দেখাতে থাকে।
- মানুষের যোগ্যতা বিকাশে সহায়ক এমন ৩ প্রকার অঙ্গের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। ২ টি চোখ, ১ টি জিহবা ও ঐ জিহবাকে সংযত রাখার জন্য ২ টি ঠোঁট (যা দিয়ে মানুষ অহংকার প্রকাশ করে) দিয়ে মানুষ অনেক কঠিন কাজ করতে পারে, কঠিন পথ পাড়ি দিতে পারে।
- আল্লাহ মানবজাতিকে অন্য প্রানীদের থেকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে দুটি কঠিন পথ দেখান। ভালো ও খারাপ দুটি পথেই কঠিন পরিশ্রম করে এগুতে হয় এবং সেই পথে চলার ক্ষেত্রে বাধা না দিয়ে চলতে দেন। মানুষ ভালো পথে চললেও আল্লাহ তাকে স্বাধীনভাবে চলতে দেন, খারাপ পথে চললেও।
- মানুষ দুটি পথের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কঠিন দুর্গম পথটির দিকে যেতে চায় না-
- ডান সারির লোকদের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে-
 - খাদ্যদান করে (এখানে লক্ষণীয় বিষয় যে, বলা হচ্ছে- সেই খাওয়ানোটা হয় খুবই কঠিন দূর্ভিক্ষ এর সময়ে। অর্থাৎ সুখ সাচ্ছন্দ্যের সময়ে তো বটেই এমনকি বিপদের সময়েও তারা অন্যের প্রতি খেয়াল রাখে, সাহায্য করে।)
 - অসহায় সম্প্রদায় ইয়াতীমদেরকে সাহায্য করা
 - ধূলিমলিন মিসকীনদেরকে সাহায্য করা
 - ঈমানদার হওয়া
 - পরস্পরকে ছবরের উপদেশ দেয়া
 - পরস্পরের প্রতি দয়ার উপদেশ দেয়া
- পরস্পরকে ছবরের উপদেশ দেয়া ও দয়ার উপদেশ দেয়া এই কাজগুলো একাকী করা সম্ভব নয়। ১৭ তম আয়াতে বোঝানো হয়েছে ঈমান আনার পর ঈমানদাররা একাকী থাকার পরিবর্তে একটি দলে পরিনত হয়।
- যারা আল্লাহর আয়াত অস্বীকার করে তারা বাম সারির লোক তাদের জন্য রয়েছে পরিবেষ্টিত অগ্নি।